SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবতগীতা অনুসারে জীবন্মুক্তি ও ক্রমমুক্তির স্বরূপ বিচার

ডঃ সুস্মিতা মিস্ত্রী

অদ্বৈত শাস্ত্রকে উত্তর মীমাংসা দর্শন বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ অদ্বৈত শাস্ত্র বেদের জ্ঞান কান্ডকে নির্ভর করিয়া পরিবর্ধিত হইয়াছে। যদিও বৈদিক যুগে উপনিষদের অভাবনীয় প্রতিপত্তি থাকিলেও পরবর্তীকালে উপনিষদের আলোচনা অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত তাহার একটি বিশেষ কারণ হিসাবে বাদরায়ণ রচিত ***ব্রহ্মসূত্রে*** বেদান্ত পাঠে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মনোনিবেশকেই চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। তথাপি ষড়দর্শনের যুগে তাহাদের একটি বিশেষ মর্যাদায় আপ্তবচন হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্য প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য প্রবর্তিত দ্বৈতবাদের আলোচনায় উপনিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কর্মকান্ড হইতে পৃথক করিবার নিমিত্তই উপনিষদকে পরাবিদ্যা বলা হইয়াছে। মুন্ডক উপনিষদে পরা ও অপরা নামক দ্বিবিধ বিদ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। অপরা বিদ্যা বলিতে বৈদিক কর্মকান্ড এবং তাহার আনুষাঙ্গিক বিদ্যাকে বোঝানো হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে পরাবিদ্যা বলিতে সেই আত্মবিদ্যাকেই উপস্থাপন করা হইয়াছে যাহার দ্বারা সেই 'অক্ষর ব্রহ্ম জানা যায় 'অক্ষর' পদের অর্থ যাহার ক্ষয় নাই। যাহা স্থান কালের অতীত অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মের সমার্থবোধক । সুতরাং যে বিদ্যা বেদের উপনিষদভাগ বা বেদান্তে প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত তাহাই পরাবিদ্যা।

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করিয়া উপনিষদ্ গুলির আত্মপ্রকাশ। বেদের সংহিতা অংশে তাহার প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং আরণ্যক অংশে তাহার পরিবর্ধন হইয়াছিল। বেদের যে ভাগে যাগাদি কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে উপনিষদ্‌কে পৃথক করিবার জন্যই তাহাকে কর্মকান্ড বলিয়া সূচিত করিয়া উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়াছে।

যে স্থলে ঋষির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে আরোহণ পূর্বক বিশ্বসত্তার জ্ঞানলাভেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এবং আত্যন্তিক দুঃখ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফূট হইয়া উঠিয়াছে। মোক্ষের সাধন রূপে জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। বৈদিক সাহিত্যে যে দশ প্রধান ব্রহ্মবাদী উপনিষদ বিদ্যমান এবং যে দশটি উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন সেই

উপনিষদসমূহে প্রতিপাদ্য মোক্ষের সাধন বিষয়ক বিচার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত গ্রন্থসমূহে যে রূপে প্রতিপাদিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেইসকল বিষয়ই এইস্থলে বিচারিত হইয়াছে।

'ঈশ' উপনিষদ অনুসারে মুক্তির স্বরূপ নিরূপণঃ

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, ঈশ উপনিষদে বলা হইয়াছে যেখানে ত্যাগ নাই, আছে কেবল মোহ, আসক্তি, সেখানে কেবল দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তি বিদ্যমান। যিনি আসক্তিহীন তিনিই কেবল স্বাধীন, সকল প্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ পূর্বক জগৎকে যিনি ঈশ্বরের প্রকাশরূপে অবগত হইবেন তিনিই কেবল আনন্দ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইস্থলে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন এই জগৎ অনির্বচনীয় বা মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠিত বলিয়া সৎ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ পরমেশ্বর-ই একমাত্র পারমার্থিক সৎ পদার্থ জগৎ তাঁহার উপর অধ্যস্ত বা ভ্রমরূপে কল্পিত। এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইলে পুত্র, বিত্ত এমনকি স্বর্গাদির কামনাও ত্যাগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

এইস্থলে উল্লেখ্য যে উক্ত উপনিষদে যে ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আনন্দ উপভোগকেই সূচিত করিয়াছে। যেহেতু দুঃখভোগ কখনও কাহারও কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিই প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, যিনি তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন তিনি কেবল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ পান। ফলতঃ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি রূপ মোক্ষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যাক্তি লাভ করিতেই পারেন না।

অনন্তর উক্ত উপনিষদের নবম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে - 'অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উবিদ্যায়াং রতাঃ'। [১]অর্থাৎ যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করিয়া থাকে তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন, অপরপক্ষে যাঁহারা বিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। এইস্থলে বিশেষ হইল 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ জ্ঞানরহিত কর্ম, আর 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ হইল কর্মরহিত কেবল দেবতার উপাসনা। দেবতার অর্থ এইস্থলে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম নহেন, তাহা বিভিন্ন কর্মের ফলদাতা দেবতা অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানরহিত যে কর্ম শুধু কামনা বাসনা তৃপ্তির জন্যই করা হয় তাহার ফলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, আবার যাহারা কর্মত্যাগ করিয়া শুধুই বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় রত হইয়া থাকেন তাহারা ততোধিক অন্ধ। যেহেতু এই প্রকার উপসনার দ্বারা কদাপি আত্মজ্ঞান হইতে পারে না।শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেবতার উপাসনা বা বিদ্যার উপাসনায় দেবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষপ্রাপ্তি। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।অনন্তর উক্ত উপনিষদের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 'যস্মিন্ সর্বানি ভূতানিআত্মৈবাভূত বিজানতঃ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'

[২]অর্থাৎ যিনি সর্বত্র একই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন সেই জ্ঞানী পুরুষের শোক বা মোহ হইতে পারে না। যদিও আত্মজ্ঞানীর সর্বভূতে এক আত্মা এবং এক আত্মায় সর্বভূত এইরূপ জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। জ্ঞানের সহিত সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এইরূপে সাধক সত্যেরুপলব্ধি দ্বারা বস্তুসমূহের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ পূর্বক দিব্যচৈত্যন্যের অধিকারী হইতে পারেন। যাহার দ্বারাই তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকেন'সর্বানি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ' অর্থাৎ এক আত্মাই সমস্ত হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দের দর্শন সম্ভব হইয়া থাকে। যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাঁহার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি মূল কারণ দূরীভূত হইয়া যায়। এই প্রকারে আত্মজ্ঞানীর আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্ত, শোকনিবৃত্ত ও মোহ নিবৃত্ত রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতঃপর 'ঈশ' উপনিষদের অষ্টাদশ সূত্রে বলা হইয়াছে-'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজুহুরাণমেনোভূয়িষ্টাং তে নম-উক্তিং বিধেম'।[৩] অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের গতির দুইটি প্রধান পথ বা মার্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। একটি হইল দেবযানমার্গ এবং অপরটি পিতৃযান যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থী ও পঞ্চাগ্নির জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থগণ তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযানমার্গে গমন করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রথমে অগ্নিলোকে গমন করেন তৎপর দিবস শুক্লপক্ষ, ষড়মাস উত্তরায়ণ দেবতা, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি বিবিধ লোক ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন, এবং তথায় আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, এই প্রকার মুক্তি হইল ক্রমমুক্তি।

'কেন' উপনিষদ অনুসারে মুক্তি বিষয়ক আলোচনাঃ

অনন্তর 'কেন' উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে – যাঁহারা 'ব্রহ্মকে জানিয়াছি' এইরূপে ধারণা করেন , প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। যেহেতু ব্রহ্ম প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অসীম , দেশকালাতীত, পক্ষান্তরে যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, এইঘটনাটির বিষয়ে যে সকল বোধ বা প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরসাহায্যে উৎপন্ন হইলেও ইন্দ্রিয়- মন –বুদ্ধি উহাদের প্রকাশক নহে, কারণ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি হওয়ায় তাহাদের স্বকীয় কোন প্রকাশশক্তি নাই, আত্মাই এই সমূহ জ্ঞানের প্রকাশক। আত্মজ্ঞানী তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এক আত্মাই সমস্ত প্রতীতিগুলিকে ধারণ করিয়া আছে, এই প্রকারে প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সহিত আত্মার যে উপলব্ধি – ইহাই হইল যথার্থ জ্ঞান বা সম্যগ্‌দর্শন। এইরূপ সম্যগ্‌দর্শন হইতেই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, এবং সম্যগদর্শী ব্যক্তিই শোক,

দুঃখ অজ্ঞান মোহময় পার্থিব জীবনের উর্দ্ধে আরোহন পূর্বক অমৃতময় আনন্দময় জীবন পরম্পরায় জীবন লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। কাজেই বিদ্যা হইতে অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানীর নিকট জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। এক পরমাত্মাই বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। এইপ্রকার যে একাত্মার জ্ঞান তাহাই বিদ্যা। এইপ্রকার বিদ্যা লাভ হইলে তিনি আনন্দময়, মুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মকে সম্যক রূপে জানিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি অর্থাৎ অমৃতময় আনন্দময় মুক্ত জীবন লাভ করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। সুতরাং যিনি প্রত্যেক বুদ্ধির প্রত্যয় ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক ভূতে যাহার ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে তাহার ইহজন্মেই মুক্তির আস্বাদ লব্ধ হইয়া থাকে ,

অতঃপর 'কেন' উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে-'যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি,[৪]অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা এই প্রকারে অবগত হন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কঠোপনিষদে বর্ণিত মুক্তিঃ

অতঃপর কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার কঠ বা কাঠক ব্রহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদ খানি হইল কঠোপনিষদ, উল্লেখ্য যে, ইহা আচার্য শংকরের ব্যাখা অনুযায়ী দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রতিটি অধ্যায়ে তিনটি করিয়া বল্লী বিদ্যমান। কিন্তু মধ্বাচার্য তাঁহার ভাষ্যমধ্যে উপনিষদটির অধ্যায়গত ভাগ না করিয়া ছয়টি বল্লীতে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

কঠোপনিষদে মুক্তি বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করিতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে দ্বাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে 'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মান প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষয়া সূক্ষদর্শিভিঃ।[৫] অর্থাৎ যে পুরুষকে জীবের সর্বোত্তম গতি বলা হইয়াছে তিনি আত্মরূপে সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হন না অর্থাৎ সকলে ইঁহাকে স্বীয় আত্মরূপে জানিতে পারেন না। যে সকল জ্ঞানীলোকের বুদ্ধি সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের যোগ্য হইয়াছে, সেই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নির্মল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ দর্শনই হইল সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান বা উপলব্ধি, যাহা উপলব্ধির উপায় হইল বিজ্ঞান বা বোধ। বুদ্ধি নির্মল ও সূক্ষ্ম হইলেই এই বোধ বিকশিত হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে আত্মা বিজ্ঞাত হইলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহজীবনে যে সুখ-দুখঃ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, কামনা –বাসনা তাহাই মৃত্যু। আত্মবিৎ ব্যক্তি এইরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন।

অনন্তর উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে চতুর্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে – 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্যহৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'।[৬] অর্থাৎ ইহজীবনে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করাই মানব জীবনের অভীষ্ট। এইরূপ অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত প্রয়োজন প্রতিবন্ধক দূরীকরণ। উল্লেখ্য যে, বিষয়ের আসক্তি এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনা আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। এইপ্রকার কামনা-বাসনার দ্বারা চিত্তের বিক্ষোভ ও মালিন্য জন্মায়, এবং বিক্ষিপ্ত মলিন চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। হৃদয় হইতে এই সকল কামনা বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে মানুষ ইহজন্মেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,***শ্রীমদ্ভগবতগীতা*** তে যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা কঠোপোনিষদের উক্ত শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রশস্ত হইয়াছে।

মান্ডুক্য উপনিষদ অনুসারে মুক্তির স্বরূপ নিরূপণঃ

অতঃপর মান্ডুক্য উপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে -'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তাস্যোপব্যাখ্যানম্ -ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব'।[৭] অর্থাৎ 'ওম্' পরমাত্মার বা ব্রহ্মের নাম। ওম্ শব্দকে আবার ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শালগ্রামকে অবলম্বন পূর্বক যেমন বিষ্ণুপূজা করা হয় অর্থাৎ শালগ্রাম এইস্থলে বিষ্ণুর প্রতীক। তেমনি ওঙ্কার কে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করা হইয়া থাকে। এইস্থলে প্রাসঙ্গিক যে, অন্যান্য উপনিষদে যথা কঠোপনিষদে 'ওম' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে সমস্ত বেদ যে পদ বা প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সমস্ত তপস্যা যাঁহার উদ্দেশ্যে করা হয়, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া সাধকগণ ব্রহ্মচর্য করিয়া থাকেন, সেই প্রাপ্তব্য বস্তুই ওম্। প্রশ্ন উপনিষদে বলা হইয়াছে পর ও অপর ব্রহ্মই হইলেন ওঙ্কার। অনন্তর মুন্ডক উপনিষদেও উল্লেখিত হইয়াছে আত্মাকে ওম্ বলিয়া উপাসনা করিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঙ্কার এর উল্লেখ করা হইয়াছে – এই দৃশ্যমান জগৎ 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক অর্থাৎ 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারা সূচিত 'ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ' যাহা কিছু ত্রিকাল ছিল, আছে বা হইবে সেই সমস্তই ওঙ্কারাত্মক। যাহা ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কার। এইরূপ ত্রিকালাতীত সত্তাই হইল পরব্রহ্ম। অতঃপর উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে – 'সর্বং ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ'[৮]অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, এই আত্মা চারিটিপদ বিশিষ্ট। তন্মধ্যে যিনি জাগ্রত অবস্থায় বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা, সাতটি অঙ্গ যাঁহার, উনিশটি উপলব্ধির দ্বার এবং যিনি শব্দাদি স্থূল বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বরূপ পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ। দ্বিতীয় পাদ হইল যিনি সপ্নাবস্থায় অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা, যিনি শুধুমাত্র সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি তৈজস। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। অনন্তর উক্ত উপনিষদের পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে – নিদ্রিত ব্যক্তি যে অবস্থায় কোন কিছু কামনা করে না, কোনো স্বপ্নে নিমগ্ন

থাকে না, সেই অবস্থাকে বলা হয় সুষুপ্তি অবস্থা। সাধক যখন এইরূপ অবস্থায় থাকেন তিনি পৃথক জ্ঞানরহিতপ্রজ্ঞাসমৃদ্ধ, আনন্দময়, আনন্দভোগী ও চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার। সেই প্রজ্ঞাই আত্মার তৃতীয় পাদ, অনন্তর প্রকৃতপক্ষে সেই অদ্বৈত তত্ত্ব আত্মা যিনি বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী নন, সুষুপ্ত অবস্থায় প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নন, সর্বজ্ঞ নন, অচৈতন্য নন। তিনি দৃষ্টির আগোচর লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অনুমানের আযোগ্য, মনের আগোচর, প্রমাণ বহির্ভূত। কেবলমাত্র আত্মারূপে যিনি অনুভব যোগ্য, জগৎ-চরাচর হইতে ভিন্ন, শান্ত, শিবও অদ্বৈত, ইনিই আত্মা, এইস্থলে আত্মার চতুর্থ বা তুরীয় পাদ ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পরমব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। আত্মার চতুর্থ বা তুরীয় পাদ ওঙ্কারের অ, উ, ম্ বিহীন অমাত্র মাত্র, এই অমাত্র ওঙ্কার অব্যবহার্য। প্রপঞ্চোপশুমশিব, অদ্বৈত। এই প্রকার ওঙ্কার আত্মাই, যিনি এইরূপে জানেন তিনি সমস্ত জগৎকে পরিমিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগতের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া যান এবং পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুক্তি বিষয়ক আলোচনাঃ

অতঃপর বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুক্তি বিষয়ক আলোচনার অবতারণার নিমিত্ত চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ শ্লোকে বলাহইয়াছে – 'তদেব সক্তঃ সহ কর্মনৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে। ইতি নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'[৯]।অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়ের অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ আসক্ত হইয়া জীব সেই ফলই পান যাহাতে ঐ জীবের পরিচায়ক মনটি উদ্ভূতাভিলাস হইয়াছে, জীব ইহলোকে যাহা কিছু কর্ম করেন, পরলোকে সেই কর্মের ভোগ শেষ করিয়া পুনর্বার কর্ম করিবার জন্য পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। উল্লেখ্য যে, যিনি ফলাকাঙ্খী তাহার এইরূপ হইয়া থাকে। পরন্তু যিনি কামনা পরতন্ত্র নহেন, যিনি অকাম, নিষ্কাম আপ্তকাম, ও আত্মকাম তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃন্দ উৎক্রমন করে না। তিনি স্বরূপত ব্রহ্ম থাকিয়াই বর্তমান দেহেই ব্রহ্মেলীন হইয়া যান অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন। মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছেতাহা যখন সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তখন এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। যেমন – প্রাণহীন সর্পনির্মোক বল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞের এই শরীর তেমনি পড়িয়া থাকে। অতঃপর ইনি অশরীর, অমৃত প্রাণ, ব্রহ্ম ও তেজই হইয়া থাকেন।

অতঃপর উক্ত উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের সপ্তম শ্লোকে কথিত হইয়াছে উপাসনা ও কর্মরূপ সমুদয় বৈদিক সাধন অবিদ্যামূলক সংসারের অন্তর্ভূক্ত। এইরূপসংসারবৃক্ষের সমূলে উচ্ছেদই পুরুষার্থ। উল্লেখ্য যে ব্যাকৃত ওঅব্যাকৃত জগৎ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন । অব্যাকৃতাবস্থ জগৎকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইস্থলে বিশেষ হইল, নিয়ন্তা আত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়াছেন। এই ব্যাকৃত জগৎ যেমন নিয়ন্তা প্রভৃতি অনেক কারকবিশিষ্ট অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ। এইরূপে অভিব্যক্তিটি কর্তৃ-সাপেক্ষ হইলেও উক্ত অভিব্যাক্তি অনায়াস সাধ্য ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হইয়ছে যে, জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইল। উল্লেখ্য যে, নামের ব্যাকৃতির অর্থ দেবাদত্তাদি বিশেষ বিশেষ নামের সহিত নামসামান্য কে অর্থাৎ নামত্ব জাতিকে সংযোজিত করিয়া সামান্যবিশেষবান্ করা। অপরদিকে রূপের ব্যাকৃতির অর্থ শুক্লাদি বিশেষ রূপের সহিত রূপসামান্যকে, অর্থাৎ রূপত্ব জাতিকে সংযোজিত করা। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থানে থাকে, তেমনি উক্ত আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইপ্রকার প্রবেশ সাধারণ অর্থে নহে, প্রত্যুত জলে সূর্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেইরূপে প্রতিবিম্বাকারে তাহার প্রবেশ কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপে আত্মার পক্ষেও জগৎসৃষ্টির পরে বুদ্ধি প্রভৃতিউপাধিতে আবিদ্যাবশতঃ প্রবেশ কল্পনা করা হয়। এতদ্ব্যাতীত অন্য প্রকারে সর্বব্যাপী আত্মার প্রবেশ অসম্ভব। বস্তুতঃ সৃষ্টি, আত্মার প্রবেশ, জগতের স্থিতি ও লয় প্রভৃতি বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের স্বার্থে তাৎপর্য নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য আত্মার যথার্থতা উপলব্ধি করানো, সৃষ্ট্যাদি বাক্যে প্রকৃতপক্ষে ভেদদর্শনের নিন্দাদ্বারা একত্বদর্শন উপপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ‘ব্রহ্ম জগতে উপলব্ধ হন’ ইহাই বুঝাইবার জন্য ‘প্রবেশ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কারণ তাহারা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে দেখে বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট অসমগ্র। তিনি যখন কেবল নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া করেন তখন প্রাণ নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন তখন বাগেন্দ্রিয় অর্থাৎ বক্তা নামে, যখন দর্শন করেন তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ দ্রষ্টা নামে, যখন শ্রবণ করেন তখন শ্রবনেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোতা নামে, যখন মনন করেন তখন মন অর্থাৎ মন্তা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, এই বিশেষবর্গের মধ্যে যিনি কেবল এক একটিকে আত্মরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি ‘আমি দেখিয়াছি’ আমি শুনিতেছি’ ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশিষ্ট রূপে জানেন , তিনি পূর্ণ আত্মাকে জানেন না, কারণ এই আত্মা যখন এক একটি বিশেষরূপে জ্ঞাত হন তখন তিনি উক্ত সমষ্টি হইতে পৃথক হইয়া অপূর্ণ হইয়া থাকেন। ইনি বস্তুমাত্র স্বরূপে ইহাদের সকলের ব্যাপক বলিয়া ‘আত্মা’ শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। অতএব ‘আত্মা’ এইরূপেই জানিতে হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইহা বিদ্যাসূত্রে অর্থাৎ এই বাক্যে উপনিষদ সমূহের সারাংশ গৃহীত হইয়াছে। কারণ ইঁহাতেই এই সমস্ত অভিন্নতালাভ করিয়া থাকে। যেমন সূর্য প্রতিবিম্ব সমূহ সূর্যে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, এই যে

আত্মা, এই আত্মাই জ্ঞাতব্য, আত্মলাভ ও আত্মজ্ঞান সমানার্থক বলিয়া জ্ঞানের দৃষ্টান্ত না দিয়া লাভের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান হইয়া থাকে, কারণ অনাত্মভূত নিখিল বস্তু আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় তাহাদের আত্মাতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই। এইস্থলে জ্ঞানের প্রশংসামাত্র-ই উদ্দেশ্য, জ্ঞানীর কীর্তি প্রভৃতি লাভের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কারণ জ্ঞানী এই সমস্তের প্রার্থী নহেন, 'ইনি এইরূপ জানেন' অর্থাৎ যিনি জানেন না আত্মা নামরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মরূপে 'খ্যাতি' লাভ করিয়াছেন এবং প্রাণাদির সহিত সংহত হওয়া রূপ 'শ্লোক' লাভ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ কীর্তীলাভ ও আত্মীয়বর্গের সহিত সংহতি লাভ করিয়া থাকেন। অথবা 'কীর্তি' অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের আকাঙ্খিত ঐক্য জ্ঞান এবং 'শ্লোক' অর্থাৎ জ্ঞানের ফল মুক্তি। যিনি ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তিনি মুক্ত হন।

অনন্তর বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকান্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মোক্ষের ও বন্ধন নাশের সাধন সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। এইস্থলে কৌষীতকেয়ঃ অর্থাৎ কুষীতকের পুত্রের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন সর্বান্তর আত্মা কিরূপ ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন – যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ এবং জরামৃত্যুর অতীত। এইস্থলে উল্লেখ্য যে, ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা প্রাণের ধর্ম, শোক হইল অভীষ্টবস্তু পাইবার জন্য চিন্তাবশতঃ চিন্তাকারীর মনের যে নিরানন্দ অবস্থা , ইহাই কামনার বীজ, কেননা কামনা ইহার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে এবংমোহ হইল বিপরীত প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অবিবেক বা ভ্রম, সুতরাং মোহ হইল সকল অনর্থের বীজস্বরূপ অবিদ্যা। ইহারা মনের ধর্ম। জরা হইল দেহের বলী পলিতাদিরূপ বিপরিণাম এবং মৃত্যু হইল দেহের বিচ্ছেদ। ইহারা শরীরের ধর্ম। কাজেই এই বাক্যের তাৎপর্য হইল শরীর মন ও প্রাণের ধর্মের দ্বারা আত্মা অস্পৃষ্ট।

এইস্থলে বিশেষ হইল যাহা পুত্রকামনা তাহাই যখন বিত্তকামনা এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই যখন লোককামনা – কারণ উভয়েই কামনা, অতএব উক্ত এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মনগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিদ্যারূপ বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। নিঃশেষে জ্ঞানবল ও আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অতঃপর মননশীল হইবেন। মনন ও অমনন নিঃশেষে জানিয়া অতঃপর ব্রাহ্মণ হইবেন, অর্থাৎ যিনি বাসনাশূন্য, ক্রিয়াহীন, স্তুতিনমস্কাররহিত যাঁহার কর্মক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু যিনি নিজে অক্ষীণ, তিনি ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী, বস্তুতঃপক্ষে সাধক অবস্থায় যিনি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল একান্তমনে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার মনে শুভসংস্কার সুদৃঢ় হওয়ায় জ্ঞানাবস্থায়ও তাঁহার শরীরমন শুভকর্মে ই নিযুক্ত হইয়া থাকে; অশুভকর্মে নিযুক্ত হইতে পারেনা। এইরূপেই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত মুক্তিঃ

অনন্তর ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত মুক্তি বিষয়ক আলোচনার অবতারণার নিমিত্ত বলা হইয়াছে বেদান্তের সিদ্ধান্ত হইল – জ্ঞান-ই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে বেদান্ত বিচারই প্রশস্ত পন্থা। যদিও মুক্তির উপায় হিসবে উপাসনার কথাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উপাসনার বিষয়রূপে যাহা গৃহীত হইয়া থাকে তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, এইস্থলে উল্লেখ্য যে কতকগুলি উপাসনার ফল, জ্ঞানোৎপত্তিক্রমে ক্রমমুক্তি। যে উপাসনা যত উচ্চস্তরের অর্থাৎ যাহাতে সকাম ভাব অল্পতর এবং যাহা ব্রহ্মের অধিকতর নিকটবর্তী, উহা ততই অধিক একাগ্রতা সম্পাদক। এইরূপ একাগ্রতাই পরিপক্ক হইয়া সমাধিতে পরিণত হয় এবং সমাধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, ***'বেদান্ত পরিভাষা'*** গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে –'সগুণোপাসনাও চিত্তের একাগ্রতারূপ দ্বার অবলম্বনে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সহায়ক হইয়া থাকে। এইস্থলে 'চিত্তের একাগ্রতা' অর্থে টীকাকার নিদিধ্যাসনকেই বুঝিয়েছেন। চিত্ত অনাদি কুসংস্কারের দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে উহাকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক স্থৈর্যের অনুকূল করা এইরূপ মানসব্যাপারই নিদিধ্যাসন। এইরূপ নিদিধ্যাসনই হইল ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপায়, কিন্তু উপাসনা হইল গৌণ উপায়।

যদিও দ্বৈতমত অবলম্বন পূর্বক উপাসনাকে মুক্তির উপায় হিসাবে গণ্য করা যায়, তথাপি উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদান্তসূত্রে চরম সিদ্ধান্ত হিসাবে দ্বৈতমত গৃহীত হয় নাই। অতঃপর জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম না হয়, তাহা হইলে কেবল উপাসনার দ্বারা স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মে পরিণত হইবে, ইহা আযৌক্তিক, অথচ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না হইয়া অবিনশ্বর মুক্তিলাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদান্তসম্মত মুক্তি, জ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু দ্বারা লব্ধ নহে,

উপনিষৎ অনুসারে মুক্তির স্বরূপ নিরূপণের প্রেক্ষিতে শ্রীমদ্ভগবতগীতার আলোচনাঃ

এইস্থলে বিশেষ হইল ***শ্রীমদ্ভগবতগীতার*** সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রেমকে সাধনমাত্র রূপে উল্লেখ না করিয়া উহাকে ভক্তির পরিণতাবস্থা বলা হইয়া থাকে, এবং ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, ইহাকে অবলম্বন করিলে ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভূতি হইয়া থাকে। এতাদৃশ অদ্বৈতানুভূতি ও জ্ঞান একার্থক বলিয়াই জ্ঞানীকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই আত্মসমাধিরূপ প্রেম কেবল ভক্তির পরিণতাবস্থা নহে, কারণ ক্রমমুক্তির উপায়ীভূত ভক্তি অদ্বৈতানুভূতিতে পরিণত না হইয়া ও শ্রবণাদির সাহায্য না লইয়া স্বতঃই জীবন্মুক্তি

দিতে অসমর্থ তাহা স্পষ্টরূপেশ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম হইতে দশম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ উল্লেখ্য যে, উপাসনা ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বিশেষ বর্ণনীয় বিষয়। উহার আটটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অধ্যায় এবং পরবর্তী কিছু অংশও এই বিষয়ে ব্যাপৃত। ***'বেদান্তসার*** গ্রন্থের গ্রন্থকার বলিয়াছেন –'সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপ শান্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিই উপাসনা' যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ পাদে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একটি মানসক্রিয়া যাহা জ্ঞান হইতে পৃথক, কেননা জ্ঞানক্রিয়াত্মক হইতে পারে না। যদিও ক্রিয়াত্মক উপাসনা চিত্তশুদ্ধিক্রমে পরম্পরায় জ্ঞানের সহায়ক হইলেও উহা প্রমাণজনিত জ্ঞানের কারণ হইতেপারে না, সুতরাং মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না।

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, ***শ্রীমদ্ভাগবতগীতার*** পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন

'যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'।[১০]

অর্থাৎ মননাদি সহকৃত-সাংখ্য অর্থাৎ শ্রবণনামধেয় বেদান্তবিচার ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি উপায়, তেমনি যোগনামধেয় নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও একটি উপায়। কাজেই নির্গুণের উপাসনা অসিদ্ধ, তাহা বলা সঙ্গত নহে, এইস্থলে প্রাসঙ্গিক যে, প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে - 'যিনি ত্রিমাত্র ওঁকারে পরম পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন' অর্থাৎ এইস্থলে নির্গুণেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ উপাসনা করিলে ক্রমে উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ হইয়া থাকে। এইস্থলে বিশেষ হইল আচার্য শংকর এইসকল উপাসনা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি উপাসনা কর্মাঙ্গসম্বন্ধী ও কর্ম সমৃদ্ধিকারক , অর্থাৎ কর্মফলগত অতিশয় বা শ্রেষ্ঠতার সম্পাদক। কতকগুলি অভ্যুদয়সাধন, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রদ। অপরগুলি সগুণ-ব্রহ্ম বিষয়ক ও ক্রমমুক্তিপ্রদ। অনন্তর ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়ণাচার্য বলিয়াছেন উক্ত উপাসনা দ্বিবিধ। যথা – ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা তন্মধ্যে ব্রহ্মকেই যখন গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয়, তখন তাহাই ব্রহ্মোপাসনা, কিন্তু চিত্ত প্রবল লৌকিক পদার্থের সংস্কারযুক্ত হওয়ার উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে না পারিলে যখন ব্রহ্মদৃষ্টিতে লৌকিক বস্তুর চিন্তা করা হয়, তখন উহা প্রতীকোপাসনা।উক্ত প্রকারে কোন্ কোন্ উপা্সনার কোন্ কোন্ ফলপ্রাপ্তি তাহা শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ হইল ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের, চতুর্থ খন্ডে বলা হইয়াছে নিজ হৃদয়াকাশে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মকেসাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা হইয়া থাকে। অতঃপর বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভে প্রজাপতির সহিত আপনার অভেদ চিন্তা রূপ অহংগ্রোহপাসনা বিহিত হইয়াছে। এইস্থলে উল্লেখ্য যে,

'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার চিন্তার দ্বারা যদি জীব ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান পরিস্ফূট থাকে, এবং অভেদ জ্ঞানটি আরোপিত হয় মাত্র তবে ঐ অহংগ্রোহপাসনা অপর এক উপাসনা সম্পদুপাসনারই অন্তর্ভূক্ত হইবে। আর যদি উহা প্রমাণমূলক অর্থাৎ শ্রবণ-মনন জনিত হইয়া থাকে , তবে নিদিধ্যাসন পদবাচ্য হইবে, ব্রহ্মবিষয়ক অহংগ্রহ উপাসনা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য হইল, উহাদের সবগুলিই প্রত্যেকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে, যে কোনোওটি শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া উহাতে নিরত থাকিলে ব্রহ্মলোকগমন ও ক্রমমুক্তিরূপে একই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদিও ক্রমমুক্তির উপায়ীভূত এইসকল উপাসনা তথা ভক্তি ,অদ্বৈতানুভূতিতে পরিণত না হইয়া, শ্রবণাদির সাহায্য না লইয়া , স্বতঃই জীবন্মুক্তি প্রদানে অসমর্থ।

তথ্যনির্দেশঃ

১। ***উপনিষদ,*** অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং১৭।

২। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং১৩।

৩। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং২৯।

৪। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং৬০।

৫। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং১১২।

৬। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং১৪৯।

৭। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং২৫৪।

৮। ***উপনিষদ,***অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠা নং২৫৪।

৯। ***উপনিষদ গ্রন্থাবলী,***তৃতীয় ভাগ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থপ্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩, পৃষ্ঠা নং ৩৩২।

১০।*মধুসূদন সরস্বতী , **গুঢ়ার্থদীপিকাটীকাসহ ভগবতগীতা,** নবভারত সংস্করণ , কলকাতা ,*নবভারত পাবলিশার্স , ১৩৯৩, পৃষ্ঠা নং ৪৩৭।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ***ছান্দোগ্য উপনিষদ,*** স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১১।

২। ***উপনিষদ,*** অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০।

৩।***শ্রীমদ্ভগবতগীতা,*** (শ্রীরামানুজভাষ্য), শ্রীহরিকৃষ্ণদাস (অনুঃ) কলকাতা, গীতাপ্রেস, ২০০০।

৪। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, ***বৃহদারণ্যকোপনিষদ,*** স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩।

৫। শ্রীমধুসূদনসরস্বতী, ***গূঢ়ার্থদীপিকা টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদগীতা*** (দ্বিতীয় ভাগ), দিল্লী, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১০, পৃষ্ঠা নং ৬৮৮।